সুদের হার হ্রাস

মধ্যবিত্তের বিকল্প কী?

সঞ্চয়পত্র বা ব্যাংকের আমানতের সুদের হার কমানোর ফলে সীমিত আয়ের লোকজন এখন বিকল্প নিরাপদ বিনিয়োগক্ষেত্র খুঁজছেন। সরকার কি এটি ভাবছেন?...লিখেছে আসজাদুল কিবরিয়া

বহুল আলোচিত এবং 'তথাকথিত' মুক্তবাজার অর্থনীতির 'অন্ধ-দর্শন'টা এরকম যে, অর্থনীতিতে বাজারই সব কিছু পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করবে, রাষ্ট্রের কোনো ক্ষমতা থাকবে না, থাকতে পারবে না। বাস্তবে দুনিয়ার কোথাও এই বাজারচর্চা নেই, উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এমনকি আমেরিকা যে কিনা বাজার অর্থনীতির সবচেয়ে বড় ধারক-বাহক, সেখানেও নয়। কারণটা খুব সোজা। বাস্তবে এ ধরনের কোনো উদ্ভট অর্থনৈতিক নীতি অনুসরণ করা সম্ভব নয়। বরং যেটা সম্ভব সেটা হলো, বাজারকে যথেষ্ট অবাধ ও স্বয়ংক্রিয় করার পাশাপাশি রাষ্ট্রের হাতে এমন কিছু ক্ষমতা ও উপাদান রাখা, যার সাহায্যে বাজারে কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তা যেন নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বিশ্বব্যাংক বা আইএমএফ যাই বলুক না কেন, উন্নত বিশ্ব কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে যে মূল চ্যালেঞ্জটা হলো, রাষ্ট্র ও বাজারের মধ্যে একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থা সমন্বয় করার। এটা করতে গিয়ে পাল্লাটা কখনো রাষ্ট্রের দিকে আবার কখনো বাজারের দিকে হেলতে পারে। কিন্তু কোনোটাই চিরস্থায়ী নয়, হতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, পাল্লা কখন, কোন দিকে হেলে পড়বে? এর বাঁধাধরা কোনো নিয়ম না থাকলেও একটি সাধারণ সূত্র রয়েছে। রাষ্ট্রীয় বা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যখন ক্রমাগত অদক্ষ, লোকসানি ও গণবিরোধী হয়ে ওঠে, তখন সেগুলোকে ক্রমান্বয়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের মাধ্যমে শৃঙ্খলমুক্ত করে বেসরকারিখাতে তথা বাজারের ওপর ছেড়ে দিতে হয় যেন বাজারে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকে অথবা টিকতে না পেরে ঝরে পড়ে। আবার বেসরকারিখাত যখন ক্রমাগত মুনাফার উদ্দেশ্যেই যেনতেন প্রকারে বাজারকে পরিচালিত করতে চায় এবং এর ফলে সাধারণ মানুষ বাজারের কারণে ভোগান্তি ও আয় বৈষম্যের শিকার হতে থাকে- তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার, বাজার নিয়ন্ত্রণ করার। তার মানে বিষয়টা যতোখানি না সরকারি ও বেসরকারিখাতের, তারচেয়ে অনেক বেশি দক্ষতা ও শৃঙ্খলার। আরো স্পষ্ট করে বললে, এখানে দ্বন্দ্বটা উৎপাদনশীলতা ও লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার।

সংকুচিত সঞ্চয় বিনিয়োগের নিরাপদ উৎস

বাজার অর্থনীতির নিবিড় অনুসারী ও চর্চাকারী দেশগুলো বাস্তবসম্মতভাবে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতাকে ধরে রাখায় যতোখানি নিষ্ঠা দেখিয়ে আসছে, দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো তারচেয়ে বেশি হারে বাজারমুখী হওয়ার এক যুক্তিবুদ্ধিহীন প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সাহায্য পাওয়ার জন্য সংস্কারের নামে গণহারে সবকিছু বাজারের হাতে ছেড়ে দেয়ার এক আত্মঘাতী প্রবণতা চলছে দেশে। অর্থনৈতিক খাতে বিভিন্ন সংস্কারের নামে যা চলছে, তা শেষ পর্যন্ত কতখানি সুফল বয়ে আনবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তবে বাস্তবতা হলো, এসব পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। দেশে প্রচলিত সঞ্চয়পত্রের মুনাফা বা সুদের হার কমিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়েই আলোচনা করা যাক। সাত মাসের মধ্যে সরকার দু'দফা সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার কমিয়েছে। আর এটি কমানো হয়েছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) কাছে দেয়া ইচ্ছেপত্রের আরেকটি শর্ত বাস্তবায়ন করার জন্য। ইচ্ছেপত্রে বলা হয়েছিল যে, সরকার ২০০৩ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমিয়ে ট্রেজারি বিলের সুদের হারের সমপর্যায়ে নিয়ে আসবে। আর এই শর্তটির আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো, এক পর্যায়ে

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার যেভাবে কমছে

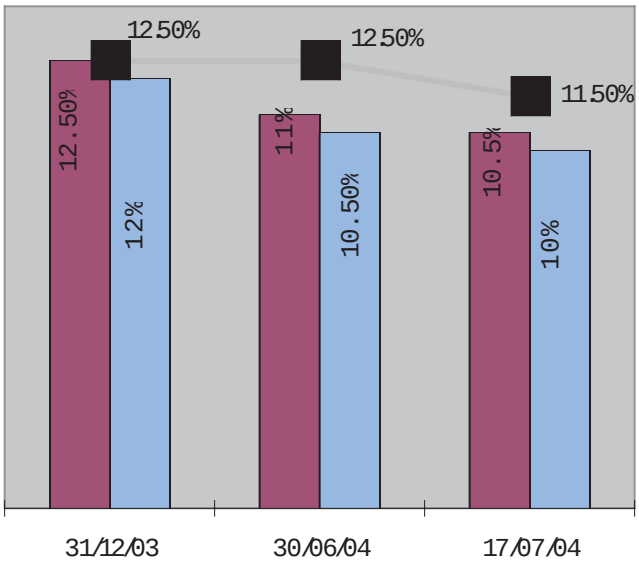

** ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের সঞ্চয়ী ও মেয়াদী সবগুলো আমানতেরই সুদ ১% কমে গেছে। এখানে মেয়াদী সর্বো চ সুদের হিসাব দেখানো হয়েছে।*

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার নির্ধারণের বিষয়টিও বাজারের ওপর ছেড়ে দেয়া। সন্দেহ নেই, সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার যথেষ্ট উচ্চ ছিল। এখন যেহেতু ব্যাংকগুলোয় সুদের হার কমাতে হবে এবং লোকজনকে বাজারমুখী বিশেষ করে পুঁজিবাজারমুখী করতে হবে, সেই যুক্তিতে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার না কমানোর কোনো কারণ নেই। ফলে সর্বশেষ গত বৃহস্পতিবার (১৫ জুলাই) প্রচলিত দুটি প্রধান সঞ্চয়পত্রেরই মুনাফার হার গড়ে ০.৫০% কমিয়ে দেয়া হয়। এর প্রায় সাত মাস আগে গত ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় এই দুটি প্রধান সঞ্চয়পত্রেরই মুনাফার হার ১.৫% কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এ দুটি সঞ্চয়পত্র হলো : ৫ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্র আর তিন মাস অন্তর প্রদেয় মুনাফাভিত্তিক তিন বছর মেয়াদি পরিবার সঞ্চয়পত্র। পাঁচ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ সঞ্চয়পত্রে গত বছর পর্যন্ত ৫ বছর মেয়াদান্তে মুনাফা দেয়া হতো ১২.৫%। ১ জানুয়ারি ২০০৪ থেকে কার্যকর হওয়া নতুন হার অনুসারে এই হার নেমে আসে ১১%-এ। আর সর্বশেষ নতুন হার অনুসারে এখন থেকে এই সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগকারীরা পূর্ণ মেয়াদান্তে পাবেন ১০.৫%। অন্যদিকে তিন মাস অন্তর প্রদেয় মুনাফাভিত্তিক তিন বছর মেয়াদি পরিবার সঞ্চয়পত্র মেয়াদপূর্তির পর ভাঙালে মুনাফা পাওয়া যাবে ১০% হারে, যা গত ছয় মাসে ছিল ১০.৫%। আর গত বছর পর্যন্ত ছিল ১২%।

সঞ্চয়পত্রের মুনাফার হার কমানোর পাশাপাশি সরকার অবশ্য সঞ্চয়পত্রের মুনাফাজনিত আয়কর ৫% কমিয়ে দিয়েছে। আবার সঞ্চয়পত্র জামানত রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার পূর্ববর্তী সুবিধাও সরকার বাতিল করে দিয়েছে। অবশ্য ১ জানুয়ারি ২০০৪-এর আগে যারা সঞ্চয়পত্র কিনেছেন তারা আগের হারেই মুনাফা পাবেন। তাদের জন্য নতুন মুনাফার হার প্রযোজ্য হবে না। একইভাবে ১৫ জুলাইর পর যারা সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ করবেন, তারাই নতুন কম হারে মুনাফা পাবেন। এর আগে যারা বিনিয়োগ করেছেন তাদের জন্য আগের হার প্রযোজ্য হবে।

অবশ্য ছয় মাস আগে যা করা হয়নি এবার সেরকম আরেকটি কাজ করা হয়েছে। তা হলো, ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের আমানতের সুদের হার কমিয়ে দেয়া। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকে সাধারণ ও মেয়াদি আমানতের সুদের হার ১% কমিয়ে দেয়া হয়েছে। এর ফলে সবচেয়ে কম সুদ পাওয়া যেতো যে সাধারণ আমানত থেকে, সেখানে এখন বছরান্তে ৮.৫%-এর বদলে ৭.৫% হারে সরল সুদ পাওয়া যাবে। আর তিন বছর মেয়াদি আমানতে সর্বোচ্চ সুদ ১২.৫% থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১১.৫%।

আগেই বলেছি, সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, ব্যাংকগুলোর ঋণে সুদের হার কমানোর অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা। কিন্তু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সরকারের এই উদ্যোগে অনেক ধীরে সাড়া দিচ্ছে। ঋণের সুদের হার এক অঙ্কের ঘরে মানে ১০%-এর নিচে নামিয়ে আনার কথা বলা হচ্ছে এক বছর ধরে। ব্যাংকগুলো জানিয়েছে, আগামী বছরের আগে তারা সেটা পারবে না। প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে তুলনা করলে অবশ্য এটাই প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের ঋণের সুদের হার বেশ উঁচু। ২০০৩ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের ঋণের ওপর গড় সুদের হার ছিল ১২.৪%। এর বিপরীতে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় এই হার ছিল যথাক্রমে ১০.৮%, ৯.৩% ও ৫.৭%। অবশ্য গত ছয় মাসে এই হার সামান্য করে হলেও নিচে নামছে। আর ঋণের সুদের হার কমালে অবশ্যই আমানতের সুদের হার কমাতে হবে। সম্প্রতি এটিও কমতে আরম্ভ করেছে। আমানতের সুদের হার কমানো মানে, যারা ব্যাংকে টাকা রাখবেন তারা আগের তুলনায় কম সুদ পাবেন। ২০০৩ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে ব্যাংকগুলো গড়ে আমানতের ওপর সুদ দিত ৬.৩%। এই হার এখন অনেকটা কমে গেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মার্চ মাসে এই হার গড়ে নামিয়ে এনেছে ৩.৫%-এ। সুদ কমেছে স্থায়ী আমানতের ওপর থেকেও।

এই যে সঞ্চয়পত্রের সুদের হার বা ব্যাংকের আমানতের সুদের হার কমছে, অর্থাৎ সাধারণ মানুষের টাকা জমা রাখার এবং জমা রেখে বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তিযোগের দুটি নিরাপদ ও নিশ্চিত উৎস থেকে উৎসরিত সুযোগ-সুবিধাকে সরকার সংকুচিত করে দিচ্ছে বাজারের দোহাই দিয়ে। এতে সরকারের প্রত্যক্ষ যে লাভ হবে সেটি হলো, এই উৎস থেকে ঋণ গ্রহণের ব্যয় কমবে। কারণ, সঞ্চয়পত্রের জন্য এখন আগের চেয়ে কম সুদ দিতে হবে। তবে এই সুদের হার কমানোর বিনিময়ে দীর্ঘমেয়াদে একটি ব্যাপক প্রাপ্তিযোগ সরকার প্রত্যাশা করছে। সেটি হলো, বিনিয়োগ বেড়ে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাওয়া যা অর্থনীতিতে অর্থ সরবরাহ বাড়াবে, মানুষের হাতে টাকা আনবে, যা কি না দেশের ভেতর কার্যকর চাহিদা বাড়াবে। আর সেই চাহিদা মেটাতে পণ্য ও সেবা সরবরাহের জন্য আবার উৎপাদনশীলতা বাড়বে। এই চক্রটিই হলো অর্থনীতির সূত্র। কিন্তু প্রায় ৬% হারে মূল্যস্ফীতির এই সময়ে সুদের হার কমানোটা আসলে সাধারণ ও নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের জন্য প্রচন্ড আঘাত হিসেবেই এসেছে। মূল্যস্ফীতির ফলে যে হারে প্রকৃত আয় কমে যাচ্ছে, সে হারে তা পুষিয়ে দেয়ার কোনো পথই সরকার খোলা রাখছে না। সরকারের উচিত হবে শক্ত হাতে মূল্যস্ফীতির হার নিয়ন্ত্রণ করা, লাগামহীন ও বিশৃঙ্খল বাজারের ওপর নিয়ন্ত্রণ জোরদার করা। আর বিনিয়োগ বাড়া? আইনশৃঙ্খলার উন্নতি না ঘটালে এটা যে হবে না তা সবাই বুঝলেও হয়তো ইচ্ছে করেই বুঝতে চায় না সরকার।

বিকল্প উৎসের সন্ধানে

সাধারণ ও সীমিত আয়ের মানুষ একটু বাড়তি উপার্জন কিভাবে করবে, কোথায় নিশ্চিন্তে তাদের অতিকষ্টে উপার্জিত টাকাগুলো জমা রাখবে বা বিনিয়োগ করবে, এ ব্যাপারে সরকার সততার সঙ্গে কিছু ভেবেছে কি না সেটা নিয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শেয়ারবাজারে বিশেষত সেকেন্ডারি মার্কেটে ফটকা খেলার জন্য টাকা নিয়ে যাওয়ার কোনো শখ বা আগ্রহ সীমিত আয়ের মানুষের নেই। তার মানে এই নয় যে, শেয়ারবাজারের প্রতি সাধারণ মানুষের কোনো আগ্রহ নেই। গত দেড় বছরের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, বাজারে প্রাথমিক শেয়ার ছাড়া হলে এবং তা ভালো ও নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হলে লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ছে আবেদন করার জন্য। কোনো কোনো শেয়ারে মোট পরিমাণের বিপরীতে দশ-বারো গুণ বা তারও বেশি আবেদনপত্র জমা পড়ছে। এর মানে হলো, বাজারে টাকা আছে এবং একজন সাধারণ সীমিত আয়ের মানুষ সামান্য হলেও টাকা খাটাতে প্রস্তুত রয়েছেন একটি নিরাপদ বিনিয়োগ ক্ষেত্রে। আর সে কারণেই এখন বাজারে দরকার কিছু ভালো ও লাভজনক কোম্পানির শেয়ার নিয়ে আসা। দেশে মোবাইল টেলিফোন কোম্পানিগুলো চুটিয়ে ব্যবসা করছে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে রাজস্ব জমা দিচ্ছে। এসব কোম্পানি কেন বাজারে শেয়ার ছাড়ছে না? সরকারের উচিত এদেরকে বাধ্য করা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শেয়ার ছেড়ে পুঁজিবাজারকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করার জন্য। ইতিমধ্যে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ একটি চিঠি লিখেছে গ্রামীণফোনের অন্যতম অংশীদার এশীয় উন্নয়ন ব্যাংককে (এডিবি)। এতে গ্রামীণফোনের শেয়ার বাজারে আনার জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় খাতে লাভজনক কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোর শেয়ারও বাজারে আনা যেতে পারে। একইভাবে বেসরকারি খাতে ব্যবসা করছে এমন তেল-গ্যাস কোম্পানি ও বিদেশী ব্যাংকগুলোকেও বলা যেতে পারে শেয়ার ছাড়ার জন্য। তাহলে শেয়ারবাজারও চাঙ্গা হবে, এর প্রতি মানুষের আস্থা কিছুটা হলেও বাড়বে। সরকার অবশ্য ট্রেজারি বিল ও ট্রেজারি বন্ড সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রির জন্য মানে সাধারণ মানুষের বিনিয়োগের জন্য কিছু

ব্যবস্থা নিয়েছে। ইতিমধ্যে বেশ কিছু ব্যাংককে ডিলারশিপ দেয়া হয়েছে। শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত করে ট্রেজারি বন্ড বিনিয়োগে আকর্ষণ তৈরির কথা ভাবা হচ্ছে। ট্রেজারি বন্ডে বিনিয়োগ করলে বছরে ৭.৫% থেকে ৮.৫% হারে মুনাফা পাওয়া যাবে। আইএমএফের চাপে সরকার অবশ্য ট্রেজারি বিলের সুদের হার কমিয়ে গড়ে ৬.৪%-এ নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

আইসিবির নতুন মিউচুয়াল ফান্ড আসছে

বিকল্প উৎসের কথা চিন্তা করেই ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি) এবার দুটি নতুন ধরনের মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে আনার উদ্যোগ নিয়েছে। আইসিবির সহযোগী প্রতিষ্ঠান আইসিবি এসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটিড (আইসিবিএএমসিএল) বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে পেনশন হোল্ডার ইউনিট ফান্ড এবং ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড। এ দুটোই বাংলাদেশের আর্থিক বাজারে নতুন পণ্য। প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি টাকার পেনশন ইউনিট ফান্ড বাজারে ছাড়া হবে। পরবর্তীকালে এটি ক্রমান্বয়ে বেড়ে ২০ কোটি, ৩০ কোটি এরকমও হতে পারে। চাকরিজীবন থেকে অবসর নিয়ে যারা পেনশন ভোগ করছেন, তারা এই ইউনিট ফান্ডে টাকা খাটাতে পারবেন। প্রথম পাঁচ বছরে ৯ শতাংশ হারে লভ্যাংশ দেয়া হবে এবং এই লভ্যাংশ দেয়ার নিশ্চয়তা দিতে যাচ্ছে খোদ আইসিবি। আর ইসলামিক মিউচুয়াল ফান্ড মূলত সেসব মানুষকে উদ্দেশ্য করে করা হয়েছে, যারা প্রচলিত সুদভিত্তিক লাভ চান না বা সুদ খেতে চান না, বরং ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক বিনিয়োগ ও লভ্যাংশ চান। এক্ষেত্রে মিউচুয়াল ফান্ডটির পোর্টফোলিও গঠন করা হবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ইসলামী শরিয়াহভিত্তিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান যেমন ইসলামী ব্যাংক বা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ার নিয়ে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগকারী বছর শেষে আয়-ব্যয় হিসাব-নিকাশের ভিত্তিতে লভ্যাংশ পাবেন। আইসিবির এটি নিঃসন্দেহ ভালো উদ্যোগ। কিন্তু এ ধরনের উদ্যোগকে সমর্থন দেয়া ও দীর্ঘমেয়াদে ধরে রাখার জন্য সরকারি নীতি-সহায়তা প্রয়োজন। যেমন বাজারে ভালো শেয়ার আনার ব্যাপারে সরকারের সক্রিয়তা। এতে একদিকে ভালো শেয়ার এসে বাজারকে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখবে, অন্যদিকে ভালো শেয়ারগুলো নিয়ে আইসিবি আরো নতুন মিউচুয়াল ফান্ড বাজারে ছাড়তে পারবে, যা সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরও আগ্রহী করে তুলবে। ইতিমধ্যে অবশ্য সরকারি-আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের অবসরভোগী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য এ মাসেই চালু করা হয়েছে পেনশন ইউনিট ফান্ড। পাঁচ বছর মেয়াদি এই সঞ্চয়পত্রে মেয়াদান্তে ১১% মুনাফা দেওয়া হবে। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর মুনাফা তোলা যাবে।

আমরা শুরুর দিকেই প্রশ্ন তুলেছিলাম সঞ্চয়পত্রের সুদের হার কমানোর সুফল পাওয়া নিয়ে। সুফল পেতে সময় লাগবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সুদের হার কমানোর পাশাপাশি অন্যান্য আর্থিক ক্ষেত্র ও উপাদানগুলোকে যেমন শেয়ারবাজারকে সমর্থন দিতে না পারলে সুফল আসবে না বরং অর্থনীতির বাজারমুখিতা বড্ড পীড়াদায়ক হয়ে উঠবে। সাধারণ ও সীমিত আয়ের মানুষের দুর্ভোগ বাড়াবে।